তারিখ ....17......
পৃঃ ১ .. কলাম ৫ ......

সৃজনশীলের আটশ' কোটি টাকা পানিতে

আইএমইডির প্রতিবেদন
না বুঝে পাঠদানে অর্ধেক শিক্ষক

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর জন্য হাতে নেওয়া প্রকল্পের ৮০০ কোটি টাকাই পানিতে গেছে। চালুর আট বছর পরও পদ্ধতিটি নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকদের মাঝেও এক ধরনের 'ভীতি' কাজ করছে। লাখ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় এ পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির বিভিন্ন বিষয়ে এ পদ্ধতি চালু হলেও শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক নামমাত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষকরা নিজেরাই এখনও এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে পারেননি। তারা বাজার থেকে নোট-গাইড বই কিনে তা থেকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরীক্ষায় সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন। এ অবস্থায় কোনো মতে পাস করতে শিক্ষার্থীরাও বিক্রি নিষিদ্ধ নোট-গাইডে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (এসইএসডিপি) নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী এখনও সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝে উঠতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তারা কোচিং ও গাইড বই অনুসরণ করছে। আর অর্ধেক শিক্ষক সৃজনশীল না বুঝেই শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছেন। আট বছর আগে সৃজনশীল পাঠদানের মানোন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারের অর্থায়নে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। তাতে কোনো ফল মেলেনি। সৃজনশীলের এমন বেহাল অবস্থা নিয়ে এর আগেও একই ধরনের প্রতিবেদন দিয়েছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সৃজনশীলের আটশ' কোটি টাকা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ইভালুয়েশন কমিটি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আইএমইডির প্রতিবেদন প্রকাশের পর শিক্ষা প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এসইএসডিপি প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বরে শেষ হওয়া কথা। এর মধ্যে এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করেছে বলেও জানা গেছে।

এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, সৃজনশীলে শিক্ষকদের দক্ষতা না আসার মূল কারণ তারা নিজেরা প্রশ্ন করতে চান না। যেনতেনভাবে এ কাজটি এড়িয়ে যেতে চান। কোনো কোনো শিক্ষক গাইড বই থেকে সরাসরি সৃজনশীল প্রশ্ন তুলে দেন। আবার দেশের কোথাও কোথাও শিক্ষক সমিতির তৈরি করা প্রশ্নপত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা জেলার সব স্কুলে পরীক্ষা নিতে বাধ্য করা হয়। এতে উপজেলার সব শিক্ষক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। সমিতির প্রশ্ন বিকিকিনির পেছনে বিশাল অঙ্কের বাণিজ্য রয়েছে। বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশ্ন করায় দক্ষতা অর্জন করবেন কীভাবে? আর শিক্ষকরাই দক্ষ না হলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে তা আয়ত্ত করবে? তিনি বলেন, প্রকল্পের টাকায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঠিকই দেওয়া হয়েছে। এখন যদি তারা সেটি কাজে না লাগান, চর্চা না করেন, নিজেরা প্রশ্ন না করেন, তবে কী করা যাবে?

অবশ্য মহাপরিচালকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন অনেক শিক্ষক। মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি বলেন, কেবল কয়েকজন শিক্ষককে ডেকে নিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাত্র তিন দিনে কয়েক ঘণ্টার ক্লাসে কী করে একজন শিক্ষক নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে যাবেন? এই শিক্ষকরা আবার এলাকায় গিয়ে অন্যদের শিখিয়েছেন। এতেই বোঝা যায়, প্রশিক্ষণের নামে কী হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশিক্ষণের নামে অর্থ লুটপাট হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে আগামী ২০ বছর লাগবে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে এই শিক্ষক মন্তব্য করেন। আইএমইডির প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট খরচ হয়েছে ৭৫২ কোটি টাকার বেশি। আর বরাদ্দ ছিল ৭৯৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দের প্রায় ৫ শতাংশ ব্যয় করা যায়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদান আরও সহজবোধ্য করতে পদ্ধতিটি চালু হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং সবার সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সম-অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণ হলেও সৃজনশীল মানোন্নয়নে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী বলেন, পদ্ধতিটি চালু রাখতে হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আরও বাড়াতে হবে। মাত্র তিন, চার বা পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণে এত কঠিন একটি বিষয় রপ্ত করা সহজ কথা নয়। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন হওয়ায় শিক্ষকরা তা নিয়ে চর্চা কম করেন। শিক্ষার্থীদের বাসায় পড়ে নেওয়ার জন্য বলেন। এতে ছাত্রছাত্রী গাইড বই নির্ভর হয়ে পড়ে।

ভয়াবহ চিত্র : প্রতিবেদনে বলা হয়, সৃজনশীল পদ্ধতির চারটি ধাপ– জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার মধ্যে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক বিষয়ের ওপর প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে পারলেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক উত্তর দিতে পারেনি। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা গণিতের ৫১ দশমিক ৭ শতাংশ, ইংরেজির ৮ দশমিক ২ ও বিজ্ঞানের ৩৩ শতাংশ বিষয় কঠিন বলে মনে করেছে। বিভিন্ন বর্ষের পাবলিক পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ ও ২০১৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার মূল কারণ গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজিতে কম নম্বর পাওয়া। ফলে ওই বিষয়গুলো বুঝতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশকে প্রাইভেট পড়তে হয় ও গাইড বই অনুসরণ করতে হয়, যা স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষার্থীরাও বলেছে। শিক্ষার্থীদের মতে, শিক্ষকদের প্রায় ৪০ শতাংশ তাদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করেন। আরও বলা হয়, পাঠ্যক্রম ও সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময় যথেষ্ট ছিল না। পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গাইড নির্ভরতা কমাতে পারেনি, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কঠিন ছিল। শিক্ষকরা প্রশ্ন প্রণয়ন ও পাঠদানে সরাসরি গাইড বই ব্যবহার করছেন। সৃজনশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে না বোঝার কারণে এখনও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কোচিং ও প্রাইভেট পড়ছে। স্থানীয় কর্মশালায় নির্বাচিত স্কুলের কোনো শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ পাননি। প্রশিক্ষণ ছাড়াই পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন।

আইটি শিক্ষার বেহাল অবস্থা : আইটি শিক্ষার বেহাল চিত্রও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান করতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হয়েছে। এর আওতায় কম্পিউটার, স্পিকার, ইন্টারনেট সংযোগ, মডেম, প্রজেক্টর, প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। এর পরও প্রায় ৭১ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, তাদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও এখনও ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানে না। মাত্র ২৩ শতাংশ বলেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক আছে। আর শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বেশিরভাগ কম্পিউটার প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে গেছে। এগুলো মেরামত করতে দক্ষ লোকবল ও অর্থের কোনো সংস্থান প্রকল্পের আওতায় ছিল না। এমনকি ই-লার্নিং স্কুলে কম্পিউটার বিষয়ে স্পেশালাইজড কোনো শিক্ষকও নেই। অন্যদিকে, অনেক পুরনো কনফিগারেশনের কম্পিউটার হওয়ায় আধুনিক ভার্সনের অনেক প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন সেখানে ব্যবহার করা যায় না। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিজ উদ্যোগে এবং কিছু বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি নিয়ে ই-লার্নিং ব্যবস্থা সচল রেখেছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের ৬ দিনের প্রশিক্ষণ ও আইসিটি উপকরণ মোটেও ই-লার্নিং পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণ : অভিযোগ রয়েছে, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে কানাডা, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে প্রমোদ ভ্রমণ করেন। অথচ সৃজনশীলের প্রশিক্ষণের দরকার ছিল শিক্ষকদের। প্রতিবেদনেও সেই চিত্র এসেছে। মাউশি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭০ জন (৬৭ জন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ১০৩ জন শিক্ষা সফর) বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফরে ১২টি ব্যাচের মাধ্যমে তারা ভ্রমণ করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ৯টি বিষয় প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত ছিল। এই কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ শেষে অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন দিলেও তা বাস্তবসম্মত ছিল না। সমীক্ষা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের ৩৪ শতাংশ মনে করে, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই। গ্রন্থাগারিক না থাকার কথা জানিয়েছে ২০ শতাংশ। ১৪ শতাংশ বলেছে, তাদের স্কুলের লাইব্রেরি বন্ধ থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রায় ৩৬ শতাংশ বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করে না।

ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন : প্রতিবেদনে প্রকল্পের কয়েকটি ভালো দিকও উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তথা কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জেন্ডার, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ বিভাগের সক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। মাউশির কয়েকটি ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণসহ মানবসম্পদের উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম, জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, বিদ্যালয়ে শিখন-শিক্ষণ পরিবেশের উন্নয়ন, দরিদ্র তথা মেয়ে শিক্ষার্থীদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একই সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়েছে।

এসইএসডিপির প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) থেকে ৭৬৮ জনকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। যেখানে মোট নমুনায়ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৪টি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশ (৪৪১টি) গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছিল। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ (১৯৯টি)। এ ছাড়া যেসব শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ছিল সমান, উভয়েরই গড় বয়স ১৪ বছর। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণির হওয়ায় তাদের কাছ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে আনা গেছে। অন্যদিকে, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫৬ শতাংশ শিক্ষক স্নাতক পাস করেছে এবং অবশিষ্ট ৪৪ শতাংশ পাস কোর্স (ডিগ্রি) পাস করে শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষামন্ত্রী যা বললেন : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, নতুন যে কোনো বিষয় রপ্ত করতে সময় একটু লাগেই। তবে শিক্ষকদের এ বিষয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। তাদেরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। নিজেরা বেশি করে সৃজনশীলের উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরির চর্চা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, সরকারের সম্পদ সীমিত। তবে এই সম্পদেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও বেগবান করা হবে। অবশ্য আইএমইডির প্রতিবেদন নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।